শ্রেণীকক্ষে নির্যাতন

প্রশ্ন যৌক্তিকতার

লিখেছেন **প্রশান্ত মজুমদার**

শিশু নির্যাতন। স্ত্রী নির্যাতন। কাজের ছেলে বা মেয়েকে নির্যাতন। সংবাদপত্রের পাতায় অহরহ এ ধরনের খবর দেখছি। কিন্তু একটি নির্যাতনকে আমরা দেখেও দেখছি না, বরং দিয়েছি মর্যাদা। আমাদের স্কুল জীবনের এ নির্যাতনের কথা প্রায়ই আড্ডার বিষয় হয়ে ওঠে। শিক্ষকের নির্যাতন। ছাত্র-ছাত্রীকে পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের নির্যাতন। অভিভাবকমণ্ডলী শিক্ষকের হাতে সন্তানের নির্যাতনকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে চলছেন যুগের পর যুগ। শ্রেণীকক্ষে কোমলমতি শিশুদের নির্যাতনের ইতিহাস বেশ পুরনো। ব্রিটিশ আমলে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যায় করলে প্রধান শিক্ষক শাস্তি দিতে পারতো। যাকে বলে করপোরাল পানিশমেন্ট। তবে ১৯৬০ সাল থেকেই এ শাস্তির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শুরু হয় বিভিন্ন গবেষণা। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে একে অসাড় বলে উল্লেখ করলো। ধীরে ধীরে এর মাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীরিক নির্যাতনের পরিবর্তে বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। পশ্চিমা বিশ্বে এ সুপারিশগুলো পূর্ণতা পায়। আমাদের শিক্ষকবৃন্দ, সমাজের অভিভাবকমন্ডলীর চিন্তাধারা থেকে যায় অন্ধকারে।

পৃথিবীর বহু দেশ যখন শিক্ষা ব্যবস্থাকে আনন্দপূর্ণ ও বা ফলপ্রসূ করতে বহুবিধ উদ্যোগ নিয়েছে, আমরা তখন বেত্রাঘাতকেই ধরে নিয়েছি শিক্ষকের হাতিয়ারের সুবুদ্ধি প্রয়োগের এক চমৎকার কৌশল! যার ছোঁয়ায় নাকি সব ছাত্রছাত্রী মানুষ হয়ে ওঠে! শুরু হয় মেধা বিচ্ছুরণ! আর এজন্য শিক্ষকবৃন্দের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এক এক শিক্ষক আবিষ্কার করেন নির্যাতনের এক এক রকম পদ্ধতি। কেননা নির্যাতনের পদ্ধতিতেও তো বৈচিত্র্য চাই। বৈচিত্র্য ছাড়া কি শিক্ষা দেয়া চলে? শহরে একটু কম হলেও গ্রামের স্কুলগুলোতে বেত্রাঘাতই শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রী নির্যাতনের প্রধান মাধ্যম। বেত ব্যবহারের বৈচিত্র্যও অনন্য। বেতটা কতোটুকু লম্বা হবে কিংবা কতোটুকু মোটা হবে, কয়টা করে বেত্রাঘাত করা হবে, কোথায় করা হবে, বেত না লাঠি হবে এসবের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দের জুড়ি মেলা ভার। এতো গেলো বেতের কথা। হাঁটু ভেঙে (হাফ চেয়ার) দাঁড়িয়ে রাখা। বসে দুই পায়ের পেছন থেকে হাত এনে মাথা নিচু করে কানে ধরানো, এক পায়ে দাঁড়িয়ে রাখা, কান মলা, চিমটি কাটা, চড় মারা, চুল টানা, ডাস্টার দিয়ে যত্রতত্র আঘাত করা এক্ষেত্রে যে শিক্ষক যতো পারদর্শী তার সুনামও ততো বেশি।

শিক্ষক মানেই বেত্রাঘাত করতে পারদর্শী হওয়া নয়। যে সব শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করছেন তারা সত্যটি ঠিকই প্রকাশ করেছেন। শুরু হয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে বিতর্ক। কোনো কোনো শিক্ষক গর্ব করে সাফল্যের সুরে বলেন এই নির্যাতনের প্রয়োজন আছে। এতে ১০০ ভাগ সুফল পাওয়া যায়। গভ: ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রেণী কক্ষে নির্যাতন সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ক্লাসে ৩০ জনের অধিক ছাত্রছাত্রী না থাকলে এ বিষয়টি মটিভেটেড করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতো। কিন্তু এর অধিক হলে কর্পোরাল পানিশমেন্টের প্রয়োজন আছে। সব ছাত্রছাত্রীর মন-মানসিকতা, আত্ম-সম্মানবোধ এক নয়। বার বার অন্যায় করতে থাকলে বেতের বিকল্প কি? আধুনিক শিক্ষার কথা বলবেন আর একটি ক্লাসে ৬০-৭০ জন ছাত্রছাত্রী থাকবে এটা কতোটা এপ্রোপ্রিয়েট?'

শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক মোহাম্মদ আজহার আলী তার 'পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন' বইটিতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে শারীরিক নির্যাতন ব্যতিরেকে এ 'বক্তৃতামূলক পদ্ধতি' অবলম্বনের কথা লিখেছেন। তিনি বইটিতে উল্লেখ করেছেন প্রতিটি শিশুই এক একটি ব-দ্বীপ। বিভিন্ন মানসিক শক্তি বা মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ একটি শ্রেণীতে অবস্থান করে। তীক্ষ্ণ, মধ্যম, ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী যেমন রয়েছে. তেমনি দূরন্ত ছাত্র-ছাত্রীও রয়েছে। সকল ছাত্র-ছাত্রীকে একই বিষয় একইভাবে শেখার জন্য বাধ্য করা চলে না। তিনি দূরন্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও অবহেলা না করে ধৈর্য ও যত্ন সহকারে এর কারণ খুঁজে বের করে ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে উপলব্ধি করে সমাধানের গতি, প্রকৃতি নির্ণয় করাসহ শিক্ষাদানের নির্ধারিত সময়ের বাইরে এদের জন্য সময় ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক মহোদয় যদি ততোটুকু ত্যাগ স্বীকার না করেন তবে তা অমার্জনীয় অপরাধের মধ্যেই পড়ে বলে বইটিতে উল্লেখ করা হয়।

নির্যাতনের ফল কখনোই ভালো হয় না। সেটা যে নির্যাতনই হোক। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র-ছাত্রী নির্যাতনের ফলটাও শুভ হয় না। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকিয়ের অর্থায়নে পরিচালিত 'প্রাইমারি স্কুল ফার্ফমিং কমিটির' টিএসপিএমপি স্ট্যাডি নামক গবেষণায় দেখা যায়, নির্যাতিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের চেয়ে অনির্যাতিতরাই ভালো রেজাল্ট করে এবং নির্যাতন কোনো সুফল বয়ে আনে না। শিক্ষা কমিশনও বরাবর তাই ছাত্রছাত্রীদেরকে শারীরিক নির্যাতন না করার পরামর্শ দিয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের ছাত্র জুয়েল, রনবী, বিবেক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'শারীরিক নির্যাতন ছাত্র-ছাত্রীদের লজ্জাবোধ কমিয়ে দেয়। শাস্তি দিলে মনে করবে লেখাপড়াটা তার জন্য নয়, শিক্ষক কিংবা মা-বাবার জন্য প্রয়োজন।' নির্যাতনের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন আনন্দপূর্ণ না হয়ে ভীতিকর হয়ে ওঠে। থাকে প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে। কোনো কোনো শিক্ষার্থী স্কুলে না যাওয়ার উপায় খুঁজতে থাকে। এতে করে স্কুলও ফাঁকি দেয়ার প্রবণতাও বেড়ে যায়। স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন ব্যাহত হয়। শিক্ষাকে আকর্ষণের পরিবর্তে চাপিয়ে দেয়া আইনে পরিণত করে। শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস গঠনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে শারীরিক নির্যাতন। এতে তারা তাদের খারাপ আচরণ বন্ধ করে না, উল্টো প্রতিবাদস্বরূপ ভিন্নভাবে এর মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে নির্যাতনকারী শিক্ষককে।

শাস্তি অপরাধ করলে তাকে পেতেই হয়। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতটি ঘটতে দেখা যায়। এ সুযোগে অপরাধ করে অনেকেই শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। আর শিক্ষকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নির্যাতন করে শুধু রক্ষাই পেয়ে যান না- উল্টো গর্ব করে বলেন, শিক্ষক যে স্থানে মারেন সেখানটা বেহেস্ত যায়। শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের ছাত্র জহিরুল ইসলাম মল্লিক ২০০০কে বলেন, 'শারীরিক নির্যাতন হচ্ছে চরম শাস্তি যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়'। একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান ২০০০কে বলেন, 'শিক্ষা কমিশন ছাত্র-ছাত্রীদের টোটালি শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করার পক্ষে সুপারিশ করেছে। ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি শারীরিক শাস্তি দেয়াকে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়। ২০০০ সালে জাতীয় সংসদে যে জাতীয় শিক্ষানীতি বিল পাস হয় সেখানে বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিয়য়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে শারীরিক নির্যাতন শিক্ষাদানের কোনো পদ্ধতি নয়। এটি শিক্ষার পরিপন্থি এবং সারা বিশ্বে নিষিদ্ধ। তিনি

আরো বলেন, একজন সাধারণ নাগরিক আরেকজনকে আঘাত করলে যে পর্যায়ে পড়ে একজন শিক্ষক কোনো ছাত্রছাত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করলে একই পর্যায়ে পড়ে।' বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টিও উল্লেখ রয়েছে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে, তাছাড়া পিটিআই, বিএড-এ শিক্ষকদেরকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেখানেও শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করার কুফল দিকগুলো সম্পর্কে শিক্ষকদের সচেতন করে দেয়া হয়। কিন্তু তারপরেও শিক্ষকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে করপোরাল পানিশমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছে। তাই ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সুপারিশে নির্দিষ্ট করেই উল্লেখ করা হয়েছিল শ্রেণীকক্ষে শারীরিক নির্যাতনের কথা। এটি আধুনিক শিক্ষার পরিপন্থি হওয়ায় নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ বিলে সে সুপারিশকে উপেক্ষা করা হয়। সেখানে শারীরিক নির্যাতন সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। যেখানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে আনন্দপূর্ণ উপভোগ্য শিক্ষানীয় বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুরুতেই রয়েছে শারীরিক নির্যাতন। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এ প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সুপারিশকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু হামিদ লতিফ ২০০০কে বলেন, 'শ্রেণীকক্ষে শারীরিক নির্যাতন শিক্ষার পরিপন্থী। এটা কঠোরভাবে তিরস্কার করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা (শিক্ষকবৃন্দ) এর পক্ষে যে যুক্তির কথাই বলুক না কেন এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।' ইউরোপ ও আমেরিকাতে শ্রেণীকক্ষে শারীরিক নির্যাতন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, সাইকোলজিক্যালি বা মানসিক নির্যাতনেরও শাস্তির বিধান রয়েছে। এমন কি ডাক্তারগণ রোগীর প্রতি অবহেলা করলে কিংবা শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদেরকে সামান্য বকাবকি করলেও তারা ওই ডাক্তার বা শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়। স্থান ভেদে যেমন শাসন-শোষণের পার্থক্য আছে তেমনি শ্রেণীকক্ষে নির্যাতনও একরকম নয়। শহরের স্কুলগুলোর চেয়ে তিন-চারগুণ বেশি নির্যাতিত হয় গ্রামের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা। আবার বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার ও স্তরের মধ্যে নির্যাতনের তারতম্য রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের চেয়ে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা অধিক নির্যাতিত হয়। কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাতে আরো কঠিনভাবে শারীরিক শাস্তি দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সর্বাধিক নির্যাতিত হয় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়। ফাজিল পর্যন্ত এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণী কক্ষে চলে অমানুষিক নির্যাতন। একটি সূত্র জানিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে দেশে শ্রেণীকক্ষে সর্বাধিক শারীরিক নির্যাতন চলছে। এখানকার ৯৭ ভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় না বুঝে মুখস্থ করার শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এখানে মুখস্থ করতে বাধ্য করা হয়। না করলে চলে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর শিক্ষকের অবিবেচনাপ্রসূত নির্যাতন।

বিকল্প অনেক সমস্যারই সমাধান দেয়। শ্রেণীকক্ষের নির্যাতনেরও বিকল্প রয়েছে। এতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভয়ের পরিবর্তে আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার নজরুল একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোঃ নূরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ আজহার আলী, আধ্যাপক আবু হামিদ লতিফ, ২০০০কে শ্রেণীকক্ষে শারীরিক নির্যাতনের বদলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। নীলক্ষেত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন কৌশল অবলম্বনের কথা। গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রশিদ উদ্দিন জাহিদ ২০০০কে বলেছেন, প্রয়োজনীয় জনবল, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি নিশ্চিত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্যাতনের আবশ্যকীয়তার কথা।' বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 'একটিভিটি বেইসড জয়ফুল লার্নিং'-এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গান-বাজনা, খেলাধুলাসহ হাতে কলমে শেখানোর ওপর জোর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। দূরন্ত শিক্ষার্থীদের লজ্জা দিয়ে অনুতাপ জাগিয়ে তোলা সম্ভব। অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান, নৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া, পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তুগুলো শ্রেণীকক্ষে ভালো করে বুঝানো হলে তা অনেক ফলপ্রসূ হয়। 'শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে' পাঠদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যদি কোনো শিক্ষার্থী পড়ে না আসে তবে ছুটির পরে তার নিকট নির্যাতন না করেই পড়া আদায় করা যায়। এতে করে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। শিক্ষকবৃন্দ যদি বুঝাতে পারে যে লেখাপড়া শিক্ষার্থীদের নিজের জন্যই প্রয়োজন তবে শারীরিক নির্যাতনের কোনো প্রয়োজনই হবে না। শিক্ষকবৃন্দের ব্যর্থতাই শারীরিক নির্যাতনের ধারা আজো টিকিয়ে রেখেছে।

শিক্ষকের হাতে শিক্ষার্থীরা নির্যাতিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এরকম বহু অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বড় জোর এক্ষেত্রে আমরা একটুখানি সমালোচনা করে থাকি। কিন্তু শিক্ষক যখন মা-বাবার বুকের শিশুকে শিক্ষার নামে খুন করে তখন থানা-পুলিশের শরণাপন্ন হতেই হয় খুনি শিক্ষকের বিচার চাইতে।

গত জুলাই মাসে কুমিল্লা শহরের চকবাজারের আলিয়া মাদ্রাসা কিন্ডার গার্টেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র কাজী জাহিদ হোসেন শিক্ষক আবদুল মতিনের ডাস্টারের আঘাতে অকালে প্রাণ দেয়। সাত বছরের জাহিদের অপরাধ ছিল সে ক্লাসে পড়া শিখে আসেনি। ঘটনার পর থেকে শিক্ষক আবদুল মতিন পলাতক রয়েছে। ওই শিক্ষক ক্লাসে ডাস্টার, পেন্সিল ও বিভিন্ন জিনিস দিয়ে শিক্ষার্থীদের মারতো বলে অভিভাবকগণ অভিযোগ করেছেন। নিহত জাহিদকেও ডাস্টার দিয়ে আঘাত করেছিল মাথায়। জাহিদ নিহত হবার পর তার মা নাজমা আকতার ছেলের লাশের পাশে বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘাতক শিক্ষক আব্দুল মতিনের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে এনিয়ে কোনো কথা বলতে দেখা যায়নি।

শরৎচন্দ্রের দেবদাস বা শ্রীকান্ত, সৈয়দ মুজতবা আলীর পণ্ডিতমশায় গল্পে, জাফর ইকবালের শিশু সাহিত্যেও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীবৃন্দের নির্যাতিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ক্যাডেট স্কুলগুলোতেও শারীরিক নির্যাতন হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষকরা বেশি নির্যাতন করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এ নির্যাতন তা কোনো কাজে আসে না। যা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। তাই শিক্ষকবৃন্দ নির্যাতনের বদলে ফলপ্রসূ পাঠদানের জন্যে বেছে নিক বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিভিন্ন কৌশল। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে উঠুক নির্যাতনের বদলে আকর্ষণীয়, আনন্দপূর্ণ। এ ধরনের প্রত্যাশা ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের।

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

কুইজ প্রতিযোগিতা

বিস্তারিত জানতে ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

- আপনি কি একজন স্মার্ট মা?
- আপনার সন্তান কি জিনিয়াস?

জিতে নিন ফ্রিজ, কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট এবং আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার